**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বুধবার, ০৫ শ্রাবণ ১৪১৮, ২০ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীগণ,

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,

মৎস্যজীবী ভাই ও বোনেরা,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি আশা করি এ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে জনগণকে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় দেড় কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সরাসরি প্রায় ১৩ লাখ মৎস্যজীবীর সার্বক্ষণিক পেশা মাছ ধরা। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কৃষিজ আয়ের শতকরা ২২ দশমিক ২৩ ভাগ আসে মৎস্যখাত থেকে।

আমাদের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ যোগান দেয় মৎস্য খাত। এজন্য দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মৎস্যখাত উন্নয়নকে আমরা অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছি।

নদী-নালা, খাল-বিল আর হাওর-বাওরের দেশ বাংলাদেশ। একটা সময় ছিল, যখন যেখানেই পানি, সেখানেই মাছ পাওয়া যেত। বাঙালি মাছ ছাড়া ভাত খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না। সেজন্যই বোধ হয় ‘মাছে ভাতে বাঙালি' প্রবাদের প্রচলন হয়েছে।

কিন্তু সেদিন আর নেই। মাছের আবাসস্থল সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। খাল-বিল আর হাওর-বাওর শুকিয়ে যাচ্ছে। পলি জমা পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য পানিতে মিশছে। এ ধরনের দূষিত পানিতে মাছের বংশবিস্তার হয় না।

তার উপর অনেকেই ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ উপকরণ যেমন কারেন্ট জাল দিয়ে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ ধরে থাকেন। যারফলে আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে মাছের উপাদন কমে গেছে।

এক সময় প্রায় শতভাগ মাছ আহরণ করা হত প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশে।

এ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মাছ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির জন্য অল্প পরিসরে কীভাবে বেশি মাছ উৎপাদন করা যায়, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

আর এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃতিক উৎসগুলো রক্ষায় আমাদের সর্বাধিক যত্নবান হতে হবে। আমাদের এখনও প্রায় ১০ লাখ হেক্টরেরও অধিক নদ-নদী, ৩ লাখ হেক্টরেরও বেশি হাওর-বাঁওড় এবং খাল-বিল রয়েছে। রয়েছে খননকৃত সাড়ে দিন লাখ হেক্টর আয়তনের পুকুর-দীঘি। তাছাড়া বর্ষা মওসুমে আমাদের বিশাল প্লাবনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ লাখ হেক্টরেরও অধিক।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যাতে প্রাকৃতিক জলাভূমিতে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বংশবিস্তার করতে পারে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, শিল্প ও নগর বর্জ্য যাতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বংশ বিস্তার ও দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়ে যাতে পর্যাপ্ত নাব্যতা বিদ্যমান থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে আমি সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকারের দায়িত্ব পালনকালে দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলাম। সে সময় মাছের উৎপাদন ১৩ লাখ ৬১ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১৮ লাখ ৯০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করেছিলাম।

১৯৯৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তরকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক সম্মানজনক ‘‘এডওয়ার্ড সওমা'' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সফলতার জন্য গত বছর আমরা ‘ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এওয়ার্ড' অর্জন করেছি।

চলতি মেয়াদে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশের জলমহালগুলোতে পেশাদার মৎস্যজীবীদের নিরঙ্কুশ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে জাতীয় জলমহাল নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

গুণগতমানের পোনা ও খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০০৯ পাশ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১০ অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম আইনের খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং ফিস কোয়ারেন্টাইন আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমুদ্রে মৎস্য আহরণ বিষয়ে ২০১০ সালে ইউরোপীয় রেগুলেশন অনুযায়ী ইতোমধ্যেই বিধিমালা জারি করা হয়েছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ ও জাটকা ধরা বন্ধ করার লক্ষ্যে এক দশকের ইতিহাসে গত অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।

নিয়মিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১৫টি জেলার ৮৫টি উপজেলার প্রায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩শ' পরিবারকে প্রায় ৪৬ হাজার মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়।

পূর্বে ১০টি জেলায় এই কর্মসূচির আওতায় ছিল। এবার আমরা আরও ৫টি জেলা অন্তর্ভূক্ত করি। তাছাড়া, জাটকার ধরার সঙ্গে জড়িত মৎস্যজীবীদের টেকসই বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকূলীয় ৪টি জেলায় প্রায় ৪ হাজার ৪শ' পরিবারকে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলাদাভাবে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন, জাটকা নিধনরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন গত বছর ১৫ হাজার মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লাখ ১৩ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছে।

সুধিমন্ডলী,

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিশেষ করে চিংড়ি রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকি। এই চিংড়ি ও চিংড়ি রপ্তানি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ৬ লাখ পরিবার এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১২ লাখ পরিবার জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

বিএনপি-জামাত সরকারের উদাসীনতার কারণে প্রক্রিয়াজাত চিংড়িতে নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক পাওয়ার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।

আমরা ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে দ্রুত এ সমস্যা সমাধান করি। ফলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদার দিকে নজর রেখে মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা ও কক্সবাজারে স্থাপিত পিসিআর ল্যাব ব্যবহার ও পরিচালনার খসড়া নীতিমালা ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। আর সমুদ্রে রয়েছে আমাদের বিশাল মৎস্য সম্পদ। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের এত বিশাল ভান্ডার থাকা সত্বেও দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ আসে সমুদ্রের আহরণ থেকে।

সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য আইডিবির অর্থায়নে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মেরিন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একইসঙ্গে সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রেগুলেশন বাস্তবায়নের জন্য ক্যাচ সার্টিফিকেট ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাগরে মৎস্য সম্পদ জরিপ, নতুন চারণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অভিপ্রয়ানশীল প্রজাতি সংরক্ষণ, মনিটরিং ও সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম জোরদারকরণের সুযোগ রেখে ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি মৎস্য আহরণও বেড়ে যাবে।

প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,

দীর্ঘদিন আপনাদের পদোন্নতি ও শুন্য পদে নিয়োগ বন্ধ ছিল। আমরা ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। পদোন্নতির জট খুলে দিয়েছি।

আপনাদের কাজের পরিধি বেড়েছে। কিন্তু লোকবলের সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করার মত কোন মাঠকর্মী নেই। গত বছর আমি একটি যুগোপযোগী জনবল কাঠামো তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই তা তৈরি হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি।

এখন আপনাদের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এ খাতের উন্নয়ন করা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে মৎস্য খাতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে কোন ধরনের অবহেলা সহ্য করা হবে না। গ্রামে-গঞ্জে মৎস্য চাষী এবং খামারিগণ যাতে সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি সরকারি জলাশয়গুলো যাতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত ও পরিচালিত হয়, সেদিকে যত্নবান হতে হবে।

দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলেই তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

বিগত আড়াই বছরে আমরা শুধু সরকারি খাতেই প্রায় পৌণে তিন লাখ মানুষের চাকুরি দিয়েছি। জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। পোশাকখাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মানুষের গড় মাথাপিছু আয় ৮১৮ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

এসব পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যেই দারিদ্র্যের হার সাড়ে আট শতাংশে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করতে চাই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ও বেকারত্ব দূর করে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই।

এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আসুন সব মতপার্থক্য ভুলে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে একযোগে কাজ করি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....